সম্মানিত আলেমদের প্রতি

হেযবুত তওহীদ

সম্মানিত আলেমদের প্রতি

হেযবুত তওহীদ

সম্মানিত আলেমদের প্রতি

প্রচ্ছদ: মনিরুল ইসলাম চৌধুরী
প্রকাশক:

তওহীদ প্রকাশন
৩১/৩২, পি.কে. রায় রোড,
পুস্তক ভবন, বাংলাবাজার, ঢাকা।
ফোন: ০১৬৭০-১৭৪৬৪৩, ০১৬৭০-১৭৪৬৫১
www.hezbuttawheed.org
ফেসবুক: আসুন সিস্টেমটাকে পাল্টাই; Let's change the system
প্রকাশকাল: ৩০ এপ্রিল ২০১৬
ISBN: 978-984-8912-38-6

মূল্য: ২০.০০ টাকা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ঘোর সঙ্কট থেকে জাতিকে নিরাপদ রাখতে আলেম সমাজের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা অপরিহার্য

মোহতারাম,

সালাম নিবেন। আজ বিশ্বময় যে অন্যায়, অবিচার, যুদ্ধ, রক্তপাত এক কথায় অশান্তি চলছে এমন অস্থিতিশীল পরিবেশ ইতোপূর্বে আর হয় নি। বিশেষ করে মুসলমান নামক এই জাতিটির উপর চলছে অবর্ণনীয় নির্যাতন, নিপীড়ন। তাদের দুঃখ, কষ্ট, দুর্ভোগ ভাষায় প্রকাশ করার নয়। তারা সংখ্যায় ১৬০ কোটি হয়েও সকল জাতির আক্রমণের শিকার, একটা একটা করে মুসলিম প্রধান দেশগুলোকে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে। বোমার আঘাতে মরছে মুসলিম, সাগরে ভাসছে মুসলিম, উদ্বাস্তু হচ্ছে মুসলিম, কৃত্রিম দুর্ভিক্ষে না খেয়ে মরছে মুসলিম। **একে একে বিরাণ ভূমিতে পরিণত হচ্ছে সমস্ত মুসলিম দেশ, ধ্বংসস্তূপে পরিণত হচ্ছে তাদের বাড়িঘর, মসজিদ-মাদ্রাসাসহ সকল স্থাপনা**। এর কারণ কী?

এ কারণটাই আমরা বলছি যে, মানবজাতির যিনি স্রষ্টা মহান রাব্বুল আলামিন, তিনিই ভালো জানেন যে মানুষ কীভাবে চললে শান্তি পাবে। তিনি বাবা আদম (আ.) থেকে শুরু করে আখেরি নবী মোহাম্মদ (দ.) পর্যন্ত সকল নবী-রসুলের মাধ্যমে মানবজাতির জন্য সঠিক পথনির্দেশ (হেদায়াহ) পাঠিয়েছেন। যখনই মানুষ আল্লাহর দেওয়া সেই দীনকে প্রত্যাখ্যান করে নিজেরা তাদের জীবনব্যবস্থা বানিয়ে নিয়েছে তখনই তাদের জীবনে নেমে এসেছে অশান্তি। তাদের এই অশান্তি যে কেবল দুনিয়াবি তা নয়, আল্লাহর দীন প্রত্যাখ্যান করার শাস্তিস্বরূপ আখেরাতেও তারা অনন্তকাল জাহান্নামে অবস্থান করবে।

পূর্ববর্তী নবী-রসুলগণ এসেছেন পৃথিবীর কোনো একটা নির্দিষ্ট অঞ্চল বা গোত্রের জন্য। কিন্তু শেষ নবী মোহাম্মদ (সা.) এসেছেন সমগ্র মানবজাতির জন্য। পবিত্র কোর'আনে আল্লাহ তাঁর রসুলকে বলেছেন এই ঘোষণা দেওয়ার জন্য যে, 'হে মানবজাতি, আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রসুল' (সুরা আরাফ ১৫৮)। তাঁর উপাধি আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন রহমাতাল্লিল আলামিন অর্থাৎ সমস্ত বিশ্ব জাহানের জন্য রহমতস্বরূপ। এর অর্থ হল তাঁকে আল্লাহ তা'আলা পাঠিয়েছেন মানবজাতির জন্য শেষ উদ্ধারকারী হিসাবে, শেষ শাফায়াতকারী হিসাবে **এবং শেষ জীবনব্যবস্থা মানবজীবনে প্রতিষ্ঠা করে শান্তি, সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য**।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কোর'আনে অন্তত তিনটি আয়াতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, "আল্লাহ স্বীয় রসুলকে প্রেরণ করেছেন হেদায়াহ ও সত্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা (দীনুল হক) সহকারে যেন রসুল একে অন্যান্য সকল দীনের উপরে

বিজয়ী করেন (সুরা তওবা ৩৩, সুরা সফ ৯, সুরা ফাতাহ ২৮)। অর্থাৎ **আল্লাহ তওহীদ ও তওহীদভিত্তিক জীবনব্যবস্থা নবীকে প্রদান করেছেন এবং এটাকে প্রতিষ্ঠা ও কার্যকর করার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন তাঁর রসুলকে।** সেজন্য তিনি বলেছেন যে, আমি আদিষ্ট হয়েছি মানবজাতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ এবং আমাকে তাঁর রসুল হিসাবে মেনে নেয় [আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বোখারী ও মুসলিম]। আল্লাহ রসুলকে পাঠিয়েছেন মানবজাতির সামগ্রিক জীবনে শান্তি, ন্যায় ও সুবিচার নিশ্চিত করার জন্য এবং তাঁকে আমাদের জন্য করেছেন সর্বোত্তম আদর্শ (সুরা আহযাব ২১)। তাই মহানবী আইয়্যামে জাহেলিয়াতের অশিক্ষা, কুশিক্ষা, অনৈক্য হানাহানি ইত্যাদিতে লিপ্ত বর্বর আরবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করলেন একটি কথার উপরে - লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ (সা.) অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোনো হুকুমদাতা নেই এবং মোহাম্মদ (সা.) আল্লাহর প্রেরিত রসুল। সোজা কথায় এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, জীবনের যে কোনো অঙ্গনেই হোক যেখানে আল্লাহর কোনো হুকুম, রসুলের কোনো হুকুম আছে সেখানে অন্য কারো হুকুম আমরা মানবো না। এই একটি কথার উপর তিনি আরব জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করলেন। **এর আগেও আরবরা আল্লাহকে বিশ্বাস করত, ক্বাবাকে আল্লাহর ঘর মনে করেই হজ্ব করত, খতনা করত, যে কোনো কাজের আগে বেসমেকা আল্লাহুম্মা বলত, নিজেদের সন্তানের নাম আব্দুল্লাহ (আল্লাহর দাস) রাখত। কিন্তু তওহীদে না থাকার কারণে তারা ছিল কাফের-মোশরেক। তাদেরকে আল্লাহর রসুল যখন সামগ্রিক জীবনে আল্লাহর হুকুমের পক্ষে, সত্যের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ করলেন, তখন তারা মো'মেন-মুসলিমে পরিণত হলো।** যারা কিছুদিন পূর্বেও হানাহানিতে লিপ্ত ছিল তারা হয়ে গেল ভাই ভাই। এমন শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হলো যে একটি যুবতী মেয়ে মূল্যবান অলঙ্কার পরিহিত অবস্থায় রাতের অন্ধকারে শত শত মাইল পথ অতিক্রম করত। তার মনে কোনো ক্ষতির আশঙ্কাও জাগ্রত হতো না। এমন ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল যে আদালতে মাসের পর মাস অপরাধ সংক্রান্ত কোনো মামলাই আসত না। উটের পিঠে সম্পদ ও খাদ্য বোঝাই করে ধনীরা মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরত কিন্তু গ্রহণ করার মতো কাউকে পাওয়া যেত না। এটাই হচ্ছে তওহীদের বাস্তবিক রূপ। এই দীন প্রতিষ্ঠার ফলে এমন অকল্পনীয় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে বলেই আল্লাহ এই দীনের নাম রেখেছেন ইসলাম, আক্ষরিক অর্থেই শান্তি।

এমন শান্তি, ন্যায়, সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে দিয়ে রহমাতাল্লিল আলামিন চলে গেলেন। নির্যাতিত, নিপীড়িত বেলাল, যায়েদ, আম্মার, খাব্বাব (রা.) যাদের সমাজে কোনো মর্যাদা ছিল না, তাদেরকে তিনি উচ্চ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করলেন। **মানুষের মর্যাদার মাপকাঠি পরিবর্তন হয়ে গেল। পূর্বে মানুষের অহঙ্কার ও মর্যাদার আধার ছিল তার শিক্ষা, রূপ, পেশা, সম্পত্তি ও বংশ। আইয়্যামে জাহেলিয়াতের সেই মাপকাঠি রসুল ভেঙে চুরমার করে দিলেন।** তিনি মর্যাদার মাপকাঠি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করলেন আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ মান্য করার ক্ষেত্রে

কার কী অবস্থান ও অবদান অর্থাৎ তাকওয়া। ন্যায়ের পক্ষে অন্যায়ের বিরুদ্ধে যার অবস্থান যত শক্তিশালী সে ততই মর্যাদাশীল। আল্লাহর রসুল (সা.) উমাইয়ার ক্রীতদাস বেলালকে (রা.) ক্বাবার শীর্ষে উঠিয়ে এই মানদণ্ড মানবজাতির হাতে অর্পণ করে গেছেন। তিনি যায়েদকে (রা.) দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে নিজের পুত্র বলে সম্মান দিলেন। অর্থাৎ এক কথায় সম্মানহীন নিপীড়িত মানুষের সম্মান তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন, ধনী-গরীবের ব্যবধান তিনি দূর করলেন, অবিচার অনাচার দূর করে তিনি ন্যায়বিচার ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করলেন, দাঙ্গা হাঙ্গামা দূর করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করলেন, শত্রুদেরকে তিনি ভাই বানিয়ে দিলেন, ঐক্যহীন জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করলেন। যারা কিছুদিন আগেও ছিল স্বার্থপর, তাদেরকে মানবতার কল্যাণে সত্যদীন প্রতিষ্ঠায় উৎসর্গকৃতপ্রাণ মোজাহিদে পরিণত করলেন। যারা ছিল ভীরু-কাপুরুষ তাদেরকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দুর্ধর্ষ যোদ্ধায় পরিণত করলেন। **বঞ্চিত, অবহেলিত, পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীটি কিছুদিন আগেও যারা গোত্রের বাইরে কিছু চিন্তা করতে পারত না, সামান্য অন্যায়ের বিরুদ্ধেও কথা বলতে পারত না তারাই কী করে এমন একটি পরাশক্তিধর জাতিতে পরিণত হলো যারা একই সাথে দুই দুইটি পরাশক্তি রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্যের বিরাট সেনাবাহিনীকে সম্মুখযুদ্ধে পরাস্ত করে দিল? কিসে এই জনগোষ্ঠীটির মধ্যে এই আমূল পরিবর্তন আনল?**

এর উত্তর হচ্ছে - প্রকৃত ইসলাম যা আল্লাহর রসুল (সা.) উম্মাহর উপর অর্পণ করে চলে গেলেন এবং বলে গেলেন যতদিন তোমরা আল্লাহর কেতাব ও আমার সুন্নাহ আঁকড়ে থাকবে ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। আল্লাহ বলেছেন, তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে ধারণ করো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না (সুরা ইমরান ১০৩)। এটাই হচ্ছে জাতির শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের একমাত্র মন্ত্র।

আর জাতির বিনাশ কোন পথে আসবে সেটাও আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন, "যদি তোমরা আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রামে বের না হও তাহলে তিনি তোমাদের কঠিন শাস্তি দিবেন এবং তোমাদের উপরে অন্য জাতি চাপিয়ে দেবেন (সুরা তওবা ৩৯)।" 'তোমরা নিজেদের মধ্যে বিবাদ করবে না, তাহলে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হয়ে যাবে।' (সুরা আনফাল ৪৬)। উম্মতে মোহাম্মদী রসুলাল্লাহর (সা.) থেকে বুঝে নিলো যে তাদের জীবনের উদ্দেশ্য কী, মো'মেনের জীবনের লক্ষ্য কী, মানবজীবনের স্বার্থকতা কিসে? তারপর তারা সবাই গলিত সীসার প্রাচীরের ন্যায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্ত্রী-পুত্র, বাড়ি-ঘর, সহায় সম্পদ, ক্ষেত-খামার সমস্ত কিছু ত্যাগ করে দুর্বার গতিতে পৃথিবীর বুকে সত্যদীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বেরিয়ে পড়লেন। সেই আরব দুলালদের অকল্পনীয় কোরবানির বিনিময়ে আজকে আমরা মুসলমান হওয়ার গৌরব লাভ করেছি। **আল্লাহর রসুলের ইন্তেকালের প্রায় ৬০/৭০ বছর পর্যন্ত এই জাতি তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে গেল। সে সময় পর্যন্ত জাতিটা ছিল ইস্পাত কঠিন ঐক্যবদ্ধ, তাদের লক্ষ্য ছিল পৃথিবীময় আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠা করে মানবজীবনে শান্তি আনয়ন করা, যে দায়িত্ব আল্লাহ**

তাঁর রসুলের মাধ্যমে তাদের উপর অর্পণ করেছেন। তাইতো আল্লাহ বলেছেন যে, তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি। মানবজাতির মধ্য থেকে তোমাদের উত্থান ঘটানো হয়েছে এই জন্য যে, তোমরা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজকে প্রতিহত করবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে (সুরা ইমরান ১১০)। অর্থাৎ তাদের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ এটাই যে, তারা শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে। এটা না করলে তাদের শ্রেষ্ঠত্বের দাবি মিথ্যা হয়ে যাবে। তারা বুঝেছিলেন যে, মো'মেন হওয়ার দুটো শর্ত - ঈমান ও সংগ্রাম। আল্লাহ বলেছেন, মো'মেন শুধুমাত্র তারাই যারা আল্লাহ ও রসুলের প্রতি ঈমান আনয়ন করে, অতঃপর কোনো সন্দেহ করে না এবং জীবন-সম্পদ দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম করে। তারাই সত্যনিষ্ঠ (সুরা হুজুরাত ১৫)। সুতরাং তারা যদি জীবন সম্পদ দিয়ে সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ত্যাগ করে তাহলে তারা উম্মতে মোহাম্মদীই থাকবে না, মো'মেনও থাকবে না। এটা তারা আত্মা দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন। তাদের প্রাণান্তকর সংগ্রামের ফলে আটলান্টিকের তীর থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত অর্ধ পৃথিবীতে আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল। সর্বত্র চূড়ান্ত শান্তি, নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হলো, অর্থনৈতিক বৈষম্য ও অবিচার দূর হলো। তারা এক সুমহান সভ্যতার জন্ম দিল, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, সামরিক শক্তিতে, বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি, নতুন নতুন আবিষ্কারে, গবেষণায়, চিকিৎসায়, সাহিত্যে সমস্ত ক্ষেত্রে এ জাতি অন্যান্য সকল জাতির শিক্ষকের আসনে আসীন হয়ে গেল। অর্থাৎ তারা সকল ইতিবাচক ক্ষেত্রে বিশ্বকে নেতৃত্ব দিতে লাগল।

কিন্তু এরই মাঝে ঘটে গেছে এক মহাদুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। আল্লাহর রসুলের ইহলোক ত্যাগের ৬০-৭০ বছর পর্যন্ত পৃথিবীতে সত্যদীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার পর এ জাতি তাদের লক্ষ্য এবং তাদের উপর রসুলাল্লাহর (সা.) অর্পিত দায়িত্বের কথা বিস্মৃত হলো। তারা পৃথিবীর অপরাপর রাজা-বাদশাহর মতো ভোগ বিলাসের সঙ্গে শাসন করতে লাগলো। পরবর্তীতে যে যুদ্ধ তারা আরো কিছুকাল চালিয়ে গেল তা ছিল নিছক সাম্রাজ্য বিস্তারের যুদ্ধ।

তারা ভুলে গেল যে তারা আল্লাহর খলিফা, প্রতিনিধি। সংগ্রাম ত্যাগের ফলে তারা বিরাট একটি কর্মব্যস্ততা থেকে মুক্ত হলেন। তাদের একটি বড় অংশ দীন নিয়ে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করলেন। তারা তাদের ক্ষুরধার মেধা খাটিয়ে দীনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে লক্ষ লক্ষ মাসলা মাসায়েল রচনা করতে বসলেন। ছোটখাটো বিষয়গুলো নিয়ে ফতোয়া, পাল্টা ফতোয়া দিতে দিতে হাজার রকমের ফতোয়ার পাহাড় গড়ে উঠল। তাদের উপর ভিত্তি করে হাজারো ফেরকা আর মাজহাবে এক উম্মতে মোহাম্মদী খণ্ড বিখণ্ড হয়ে গেল।

অন্যদিকে জাতির মধ্যে জন্ম নিলো একটি বিকৃত সুফিবাদী গোষ্ঠী। তারা উম্মতে মোহাম্মদীর সংগ্রামী জীবনটাকে উল্টিয়ে একেবারে অন্তর্মুখী করে দিল। যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামী, প্রতিবাদী দুর্দান্ত গতিশীল ইসলামকে তারা সংসারত্যাগী, বৈরাগী, সাধু-সন্ন্যাসীর ধর্মে পরিণত করল। সমাজের শান্তি-অশান্তি,

নিরাপত্তা, ন্যায়-অন্যায় প্রতিষ্ঠিত আছে কিনা সে বিষয়ে উদাসীন হয়ে তারা নিজেদের আত্মার উন্নতিকেই জীবনের মূল কাজ বানিয়ে নিলো।

ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, **ঐ কয়েকশ' বছরে জাতির মধ্যে হাজার হাজার ফকীহ জন্ম নিলেন, বড় বড় আলেম জন্ম নিলেন, বহু গাউস কুতুব পীর দরবেশ জন্ম নিলেন, ইমাম জন্ম নিলেন, বড় বড় মুফাসসির, মুহাদ্দিস জন্ম নিলেন। একেকজনের ক্ষুরধার লেখনীতে বিরাট বিরাট ভলিউম ভলিউম বই রচিত হলো। কিন্তু সেই ওমর (রা.), আলী (রা.), আবু ওবায়দাহ (রা.), খালেদ (রা.), দেরার (রা.), সা'দ (রা.) মুসান্নাদের (রা.) মতো শত্রুর মনে ত্রাস সৃষ্টিকারী আর কেউ জন্ম নিলো না।**

এদিকে জাতি সংখ্যায় বেড়ে কোটি কোটি হয়ে গেল। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে জাতি তখন শিয়া, সুন্নী, শাফেয়ী, হাম্বলী, হানাফী ইত্যাদি বিভিন্ন তরিকায় বিভক্ত। তারা কীভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সত্যদীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করবেন? বরং তারা নিজেরা নিজেরা একে অপরকে দোষারোপ করে, ছোটখাটো বিষয় নিয়ে মারামারি হানাহানি করতে লাগলো। কী দুর্ভাগ্যজনক! উম্মাহর ঐক্যের প্রতীক যে ক্বাবাঘর, সেই ক্বাবায় গিয়েও প্রধান চার মাজহাবের অনুসারীরা একত্রে সালাহ (নামাজ) করতে পারেন নি। তারা ক্বাবার চার কোণে চারটি মেহরাবসহ তাবু স্থাপন করে যার যার মাজহাবের ইমামের পেছনে নামাজ পড়েছেন শতাব্দীর পর শতাব্দী।

দুর্দান্ত খরস্রোতা নদী যখন গতি হারিয়ে ফেলে তখন তাতে শেওলা জমে। এই জাতির ক্ষেত্রেও সেটাই হয়েছে। জাতির মাথার মধ্যেও পচন ধরেছে। যে জন্য আল্লাহর হাবিব শেষ রসুল (সা.) উম্মতে মোহাম্মদী জাতি গঠন করেছিলেন অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে, সেই কাজের অর্ধেক কিন্তু তখনও রয়ে গেছে। এরই মধ্যে পচনক্রিয়া সমাপ্ত হয়ে পতনের কাল আসলো, অনিবার্য পরিণতি আল্লাহর শাস্তি শুরু হলো। এর সতর্কবার্তাই আল্লাহ সুরা তওবার ৩৯ নম্বর আয়াতে দিয়েছিলেন। আল্লাহ কঠিন শাস্তি দিয়ে এই জাতিকে ইউরোপীয় জাতিগুলোর পায়ের তলার গোলামে পরিণত করে দিলেন। তখন তারা অর্থাৎ ইউরোপের খ্রিষ্টানরা আল্লাহর দেয়া সার্বভৌমত্বকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের দেয়া জীবন বিধান (দীন), বিভিন্ন রকম তন্ত্রমন্ত্র আমাদের উপর চাপিয়ে দিলো। আমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের জীবনব্যবস্থা থেকে বহিষ্কৃত হয়ে ব্যক্তিগত জীবনের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে ঢুকে গেলাম এবং সেখানেই বসে বসে ধর্মচর্চা চালিয়ে যেতে লাগলাম। ব্যক্তিগত ধর্মচর্চায় কে কত নিখুঁত তার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। ফলে পোশাকে-আষাকে আমরা কে কত নিখুঁত সেটাই এখন উত্তম মুসলমান হওয়ার মাপকাঠি ধরা হয়। ওদিকে মাথার উপর কার সার্বভৌমত্ব, হুকুম, বিধান চলছে সে বিষয়ে মহা মুসলিম, মহা আবেদদের কোনো খবর নেই।

যাহোক, আমাদেরকে পদানত করার পর চিরকালের জন্য গোলাম বানিয়ে রাখতে ব্রিটিশরা একটি শয়তানি বুদ্ধি করল। তারা দুই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেছিল -

একটি সাধারণ ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা আরেকটি মাদ্রাসা শিক্ষা। এই দুটো শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে চিন্তা-চেতনায় বিরাট মৌলিক ব্যবধান ও বৈপরীত্য রয়েছে। এখানেই তারা আমাদের জাতিটিকে মানসিকভাবে ও বাস্তবে বিভক্ত করে দিয়েছে। **মাদ্রাসা শিক্ষার উদ্দেশ্য কী ছিল তা আলিয়া মাদ্রাসার প্রাক্তন অধ্যক্ষ জনাব ইয়াকুব শরীফ "আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস" বইয়ের ভূমিকায় লিখেছেন, "মুসলমানরা ছিল বীরের জাতি, ইংরেজ বেনিয়ারা ছলে-বলে-কৌশলে তাদের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে তাদের প্রচলিত ধর্ম, শিক্ষা ও মর্যাদা হরণ করার জন্য পদে পদে যেসব ষড়যন্ত্র আরোপ করেছিল, আলিয়া মাদ্রাসা তারই একটি ফসল।** বাহ্যত এই প্রতিষ্ঠানের পত্তন করা হয়েছিল আলাদা জাতি হিসাবে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের নিমিত্ত, যাতে মুসলমানদের ধর্ম, কৃষ্টি ও আদর্শ রক্ষা পায়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মুসলমানদের ধোঁকা দেওয়াই ছিল তাদের আসল উদ্দেশ্য।" এই যে ধোঁকাটা দিল, কী সে ধোঁকা? মারটা কোন জায়গায় দিলো সেটা বুঝতে হবে।

ব্রিটিশ পণ্ডিতরা অনেক গবেষণা করে একটি বিকৃত ইসলাম তৈরি করলো যা থেকে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও জেহাদকে বাদ দেওয়া হলো এবং ব্যক্তিগত জীবনের মাসলা-মাসায়েল, ফতোয়া, দোয়া-কালাম, মিলাদের উর্দু-ফার্সি পদ্য বিশেষ করে দীনের যে বিষয়গুলো সম্পর্কে পূর্ব থেকেই বিভিন্ন মাজহাবের ফকীহদের মধ্যে বহু মতবিরোধ সঞ্চিত ছিল সেগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করলো যেন সেগুলো নিয়ে মাদ্রাসাশিক্ষিতরা তর্ক, বাহাস, মারামারিতে লিপ্ত হয়। **সেই ইসলামটিকে জাতির মনে-মগজে গেড়ে দেওয়ার জন্য বড়লাট লর্ড ওয়ারেন হেসটিংস ১৭৮০ সনে ভারতের তদানীন্তন রাজধানী কোলকাতায় আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করলো। সেখানে নিজেরা অধ্যক্ষ থেকে ১৯২৭ সন পর্যন্ত ১৪৬ বছর ধরে মুসলিম জাতিকে সেই বিকৃত ইসলামটি শেখালো।**

মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার সিলেবাসে অংক, ভূগোল, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষা ইত্যাদির কোনো কিছুই রাখা হলো না। ফলে আলেমরা বাস্তব জীবনে অনিশ্চয়তার অন্ধকারে নিমজ্জিত হলেন। কিন্তু জীবিকা ছাড়া তো মানুষ চলতে পারে না, তাই অগত্যা তারা ধর্মের বিভিন্ন কাজ করে রুজি-রোজগার করাকেই নিয়তি হিসাবে গ্রহণ করলেন। **ইংরেজ খ্রিষ্টানরা এটা এই উদ্দেশ্যে করলো যেন তারা সর্বদা পরনির্ভরশীল হয়ে থাকে এবং মেরুদণ্ড সোজা করে কখনো তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে না পারে।** ইংরেজরা তাদের এ পরিকল্পনায় শতভাগ সাফল্য লাভ করলো। সেখান থেকে কোর'আন-হাদিসের জ্ঞান নিয়ে লক্ষ লক্ষ আলেম বেরিয়ে আসছেন কিন্তু তাদেরকে জাতির ঐক্য গঠনের গুরুত্ব, জীবন-সম্পদ উৎসর্গ করে সত্যদীন প্রতিষ্ঠার প্রেরণা শিক্ষা দেয়া হয় নি। এই ষড়যন্ত্রের পরিণামে তাদের মধ্যে ধর্মীয় জ্ঞানের অহঙ্কার যেমন সৃষ্টি হলো, পাশাপাশি আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের গতিশীল ভুবন থেকে পিছিয়ে থাকার দরুন একপ্রকার হীনম্মন্যতাবোধও সৃষ্টি হলো তাদের হৃদয়ে। তাদের অন্তর্মুখিতা, ছোটখাটো বিষয় নিয়ে গোঁড়ামি, বিভক্তি ও

অন্য ধর্মের অনুসারীদের প্রতি প্রচণ্ড বিদ্বেষের কারণ এই শিক্ষাব্যবস্থার গোড়াতেই গ্রথিত রয়েছে। এ কারণে আমাদের জাতীয়ভাবে আল্লাহর দেওয়া বিধান কার্যকরি নেই এবং সেটা করার প্রচেষ্টাও তাদের মধ্যে নেই।

অন্যদিকে সাধারণ শিক্ষায় (General Education System) আল্লাহ রসুল সম্পর্কে প্রায় কিছুই শিক্ষা দেওয়া হয় নি। বরং সুদভিত্তিক অংক, ব্রিটিশ রাজা-রানির ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, গণিত, পাশ্চাত্যের ধর্মহীন রাষ্ট্রব্যবস্থা, পাশ্চাত্য দর্শন ইত্যাদির পাশাপাশি ধর্ম সম্পর্কে, ইসলাম সম্পর্কে একটা বিদ্বেষভাব শিক্ষার্থীদের মনে প্রবেশ করানো হলো। ওখান থেকে লক্ষ লক্ষ কথিত আধুনিক শিক্ষিত লোক বের হচ্ছেন যারা চরম আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর, নিজেদের বৈষয়িক উন্নতি ছাড়া আর কিছুই তারা ভাবেন না। তারা অধিকাংশই আল্লাহর দীনকে মনে করেন সেকেলে, মধ্যযুগীয় চিন্তাধারা, ধর্মকে মনে করেন কল্পকাহিনী। তাদের দৃষ্টিতে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে ধর্ম অচল। আধুনিক সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পশ্চিমাদের উদ্ভাবন এটা তারা জানেন কিন্তু এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভিত্তি যে মুসলিমরাই নির্মাণ করেছিল সেটা তাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হলো না। এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার ধর্মবিদ্বেষে এতদূর অগ্রসর যে, কথায় কথায় আল্লাহ, রসুল আর কোর'আনকে গালি দেয়। তাদের অধিকাংশই আবার মুসলিম পরিবারে জন্ম নিয়েছে। এর মূল কারণ যে বস্তুবাদী ধর্মহীন শিক্ষাব্যবস্থা, এ বিষয়টি এখন আমাদের সবাইকে পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে। দুর্ভাগ্য আমাদের জাতির, কারণ আমাদের ব্যক্তিগত ধর্মীয় জীবন পরিচালিত হচ্ছে কিছু ব্যক্তিগত আমল করে আর জাতীয় জীবন পরিচালিত হচ্ছে পাশ্চাত্য প্রবর্তিত জীবনব্যবস্থা বা System দিয়ে।

একদিকে ইসলামের মূল চেতনাবিহীন আচারসর্বস্ব ধর্মীয় শিক্ষা অপরদিকে একেবারে ধর্মহীন পাশ্চাত্য ধ্যান ধারণার একটি সাধারণ শিক্ষা। এই দুই বিপরীত চেতনায় শিক্ষিত দুটোর শ্রেণির আক্রমণ পাল্টা আক্রমণের মাঝখানে পড়ে বিশাল সংখ্যক ধর্মবিশ্বাসী সাধারণ মানুষ আজ দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য। এই দুটো চেতনার সংঘর্ষে আমাদের সমাজ, দেশ ও জাতি প্রায়ই নৈরাজ্যের মধ্যে পতিত হয়। মহান আল্লাহ পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন,

১. নিঃসন্দেহে মানুষের জীবনবিধান হিসেবে আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য একমাত্র দীন বা ধর্ম হচ্ছে 'ইসলাম' (সুরা ইমরান-১৯)।

২. কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো কবুল করা হবে না (সুরা ইমরান ৮৫)।

৩. আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামতকে সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীনরূপে মনোনীত করলাম (সুরা মায়েদা ৩)।

মানুষের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র এক কথায় সর্বব্যাপী জীবনে একটা দীন, জীবনব্যবস্থা বা সিস্টেম লাগবেই। সেটা দুই ধরনের হতে পারে। ক. আল্লাহর

দেয়া। খ. মানুষের নিজেদের তৈরি করা। কোনটা সে গ্রহণ করবে এ স্বাধীনতা মানুষকে দেয়া হয়েছে। এর উপরেই তার শাস্তি ও পুরস্কার নিহিত। আল্লাহর বক্তব্য হলো তোমাদের সীমিত জ্ঞানে (সুরা বনী ইসরাইল ৮৫) তোমরা যে দীন রচনা করেছ তা তোমাদের শান্তি দিতে পারবে না। আমি আমার নবী-রসুলের মাধ্যমে যে পথ নির্দেশনা, হেদায়াহ পাঠিয়েছি তাই তোমাদের শান্তি দিতে পারবে। যারা এর অনুসরণ করবে তাদের কোনো ভয় নেই, তারা দুঃখিতও হবে না (সুরা বাকারা ৩৮)। এ জন্যই এই দীনের নাম ইসলাম। আক্ষরিক অর্থেই শান্তি।

এখন সমগ্র মানবজাতির কথা বাদই দিলাম, যে মুসলমান জাতির উপর দায়িত্ব ছিল নিজেরা আল্লাহর দেওয়া দীনের অধীনে বাস করে শান্তিতে থাকবে এবং বাকি মানবজাতিকেও এই শান্তির আস্বাদ দিয়ে নবীর রেখে যাওয়া দায়িত্ব পালন করবে সেখানে এই মুসলমানরাই আল্লাহর দেওয়া দীনুল হক ত্যাগ করে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের তৈরি করা জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করে নিয়েছে। পরিণামে দুনিয়াময় অশান্তি।

কেউ হয়তো বলবেন, আমরা তো নামাজ পড়ি, নিখুঁতভাবে অজু করি, কেউ কেউ গভীর রাতে অতি কষ্ট করে উঠে তাহাজ্জুদ পড়ি, রোজা রাখি, হজ্ব করি, কোরআন খতম করি। আমরা বলি, হ্যাঁ তা করছেন। কিছু আমল করছেন। কিন্তু ইসলাম তো একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। সেখানে ব্যক্তিগত জীবনের পাশাপাশি অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, বিচারব্যবস্থা ইত্যাদি সর্ব অঙ্গনের বিধানই রয়েছে। সেগুলো কি মানা হচ্ছে? সার্বভৌমত্ব বা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তদাতা কি আল্লাহকে মানতে পারছেন? সেখানে মানতে হচ্ছে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের সার্বভৌমত্ব ও তাদের তৈরি অর্থব্যবস্থা, শাসনব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা ইত্যাদি সবকিছু। আল্লাহর বিধানের আংশিক মানা আর আংশিক প্রত্যাখ্যান করা কি শেরক নয়? আল্লাহ বলেন, "তবে কি তোমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছ যে আল্লাহ কেতাবের আংশিক মান্য করবে আর আংশিক প্রত্যাখ্যান করবে? এমন যারা করবে তাদের শাস্তি তো পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা আর আখেরাতে তাদেরকে ভয়াবহ শাস্তির দিকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হবে।" (সুরা বাকারা ৮৫)।

আমরা জানি, ইসলামের বুনিয়াদ পাঁচটি - তওহীদ, সালাত, যাকাত, হজ্ব, সওম। এখানে প্রথমটি হচ্ছে ঈমান আর বাকি চারটি হচ্ছে আমল। সে ঈমান অর্থাৎ তওহীদ হচ্ছে আল্লাহর সাথে বান্দার একটি চুক্তি যেখানে আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে আমরা আমাদের জীবনে ইলাহ বা হুকুমদাতা হিসাবে মানবো না। আল্লাহর নবী বলেছেন- বান্দাদের সাথে আল্লাহর চুক্তি (Contract) হচ্ছে যে তারা আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে মানবে না, তাহলেই আল্লাহ তাদের কোন শাস্তি দেবেন না (জান্নাতে প্রবেশ করাবেন)। [মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) থেকে বোখারী, মুসলিম] এটা বর্তমানে আমরা কি এই চুক্তিতে আছি? আমরা আমাদের সামগ্রিক জীবনে পাশ্চাত্যের জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করে নিয়েছি, আল্লাহর বদলে মানুষকেই ইলাহ বা বিধাতার আসনে বসিয়ে রেখেছি। এই চুক্তি ভঙ্গের পরে আর আমলের কোনো মূল্যই থাকে না।

এখন মুসলিম জাহানের অবস্থা কী? আসুন বাস্তবতার দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করি। ১৬০ কোটির এই জাতির আজ কী অবস্থা আর যখন তারা সংখ্যায় মাত্র ৫ লক্ষ তখন তারা কী অবস্থায় ছিল? দুইটি পরাশক্তি তাদের হাতে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। **তখন হাতে লেখা কয়েক কপি কোর'আন ছিল যা ঐ জাতির অধিকাংশ মানুষ জীবনে চোখেও দেখে নি, এত হাদিস, তফসির, ব্যাখ্যার তো প্রশ্নই আসে না। পক্ষান্তরে এখন ঘরে ঘরে কোর'আন, হাদিস, তাফসির, মাসলা মাসায়েলের বই। তথাপি পৃথিবীতে প্রধান যে কয়টা জাতি আছে সবার কাছে আমরা মার খাচ্ছি, আমরা আজকে লাঞ্ছিত, নিগৃহীত হয়ে ইউরোপের রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছি একটু খাদ্য ও আশ্রয়ের আশায়।** যে ভূখণ্ডগুলো রসুলাল্লাহর (সা.) আসহাবগণ রক্তের বিনিময়ে জয় করেছিলেন, সেই ভূখণ্ডগুলো আজ একটা একটা করে ধ্বংস করে দিচ্ছে, দখল করে নিচ্ছে পশ্চিমা পরাশক্তিগুলো। আমরা তাদেরকে ঠেকাতে পারছি না। প্রকৃতপক্ষে তাদের বন্দুকের নিশানা তারা তাক করেছে ইসলামের দিকে। তারা পৃথিবী থেকে ইসলাম নামক এই দীনকেই কার্যত বিলুপ্ত করে দিতে চায়।

পশ্চিমা পরাশক্তিগুলো গত শতকে দুই দুইটি বিশ্ব যুদ্ধ করার পর তাদের অধীন উপনিবেশগুলোকে আপাত স্বাধীনতা দিয়ে চলে যায়। এরপর তারা প্রধানত দুটো ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদিকে ব্রিটেন-আমেরিকার নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদী ব্লক, অন্যদিকে রাশিয়ার নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক ব্লক। এই দুটো পক্ষ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই স্নায়ুযুদ্ধ চালিয়ে আসছিল যার অবসান হয় নব্বই দশকে। রাশিয়া '৭৯ সালে আফগানিস্তানে আক্রমণ করলে রাশিয়ার বিরুদ্ধে আফগানিস্তানকে সহযোগিতা করে আমেরিকা। আফগান রণাঙ্গনে তুখোড় আফগান মুসলমানদের জেহাদী চেতনার সামনে পরাজিত হয় রাশিয়া। **অনেক বিশ্লেষক মনে করেন, এখানে সৌদি আরবকে কাজে লাগিয়ে মুসলিমদের ধর্মীয় চেতনাকে প্রবলভাবে আমেরিকার পক্ষে ব্যবহার করা হয়েছে।**

যাহোক, সমাজতন্ত্রের পতনের পর পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তিগুলো দেখল তাদের সামনে এখন আর একটা শক্তি আছে- মুসলমান; যারা মৃতপ্রায় হলেও, নিজেরা নিজেরা হানাহানি দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকলেও সংখ্যায় ১৬০ কোটি। তাদের অধিকাংশের মধ্যে একটি ঈমানী চেতনা আছে, তাদের হাতে অবিকৃত ঐশীগ্রন্থ কোর'আন আছে। যদি কোনো সূত্র ধরে আবার এই জাতিটি ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায় তবে তো বিশ্বের আধিপত্য মুসলিমদের হাতে চলে যাবে। তাছাড়া ঔপনিবেশিক দাসত্বের যুগ শেষ হওয়ার পর থেকেই সমগ্র মুসলিম বিশ্বে একটি নবজাগরণের স্পন্দন অনুভূত হচ্ছিল। মুসলিম উম্মাহর সেই হারানো গৌরবের ইতিহাসকে ফিরিয়ে আনার জন্য অনেক আন্দোলন সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। তাই এবার পশ্চিমারা তাদের বন্দুকের নিশানা তাক করলো ইসলামের দিকে।

প্রথমে তারা অনুগত মিডিয়াগুলো ব্যবহার করে মুসলিমরা জঙ্গি, সন্ত্রাসী,

ইসলামকে সন্ত্রাস, অন্ধত্ব, কূপমণ্ডুকতা, গোড়ামির ধর্ম বলে অপপ্রচার চালাতে লাগল। একটি মিথ্যা একশ বার প্রচার করলে মানুষ সেটাকেই সত্য বলে মনে করে। এভাবে শুধু পাশ্চাত্যে নয়, সারা পৃথিবীতেই ইসলাম সম্পর্কে একটি নেতিবাচক ধারণা তারা সৃষ্টি করে দিতে সক্ষম হয়েছে। এরপর তাদের পক্ষে একটার পর একটা দেশে নানা মিথ্যা অসিলায় আক্রমণ করে দখল করে নেওয়া জায়েজ হয়ে গেছে। আর এর ক্ষেত্র অভ্যন্তরীণ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক হানাহানি, দাঙ্গা ইত্যাদির মাধ্যমে পূর্ব থেকেই তৈরি করা হয়। আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ নিয়েও গভীর ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। তারা এখানেও ঐরকম একটা সঙ্কটময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারলে আমাদের অবস্থা কী হবে সেটা আমাদের আলেম সমাজকে অবশ্যই হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে।

এমতাবস্থায় আমাদের বক্তব্য হল, আমাদের এখন ঐক্যবদ্ধ হওয়া ছাড়া আর কোনো পথ নেই। আমরা তো কওমি-আলিয়া, আহলে হাদিস, আহলে সুন্নাত, শিয়া, সুন্নী, কাদেরিয়া, নকশবন্দিয়া, মোজাদ্দেদিয়া, গণতন্ত্রী, সমাজতন্ত্রী ইত্যাদি হাজারো ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছি। আমাদের সবার মধ্যে আকিদা ও আমলের বিস্তর ব্যবধান রচিত হয়েছে। এখন আমাদের ঐক্যের উপায় কি? কে আমাদের ঐক্যবদ্ধ করে দিবে? নবী-রসুল তো আর আসবেন না। আজকে ইসলামের নামে একেকজন একেক দিকে ডাকছে। **কেউ ধর্মভিত্তিক রাজনীতির পথে, কেউ জঙ্গিবাদের পথে, কেউ বিভিন্ন তরিকার পীর-বুজুর্গের পথে, কেউ বা ব্যক্তিগতভাবে নামাজ রোজা করেই জান্নাতের পথনির্দেশ করছে। এই বহুরকম মতবাদের ভিড়ে বিভ্রান্ত মুসলিম জাতি ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কোনো সাধারণ সূত্র খুঁজে পাচ্ছে না।**

এই ঐক্যেরই ডাক দিয়েছেন টাঙ্গাইলের ঐতিহ্যবাহী পন্নী পরিবারের সন্তান এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী। তিনি বললেন, আল্লাহর রসুল তাঁর সময়ের মানুষকে যেভাবে তওহীদের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন সেই একই চিরন্তন সত্য কলেমা তওহীদের উপর ঐক্যবদ্ধ করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। কারণ সব মাজহাব ফেরকার মুসলিমরাই এই কলেমার সাক্ষ্য দেয়। আমরা যে জায়গা থেকে সরে গিয়েছিলাম অর্থাৎ আল্লাহর হুকুম ছাড়া আর কারো হুকুম মানবো না এই কলেমা তওহীদের চুক্তিতে আমাদের ফিরে আসতে হবে। পাশ্চাত্য সভ্যতার সার্বভৌমত্ব প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহর সার্বভৌমত্বভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আল্লাহর সার্বভৌমত্বই হচ্ছে চূড়ান্ত সত্য। যে সমাজে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব নেই, তাঁর হুকুম চলে না সেখানে অন্য কোনো আমলের মূল্য থাকে না, কারণ সে সমস্ত আমল দিয়ে ইসলামের মূল উদ্দেশ্য যে শান্তি প্রতিষ্ঠা সেটা পূরণ হবে না। এজন্য আমাদের আন্দোলনের নাম হেযবুত তওহীদ অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌমত্বের দল। হেযবুত তওহীদের প্রতিষ্ঠাতা জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী বলেছেন, আমি নবী-রসুল, পীর-ফকির কিছুই না, আমি শেষ নবীর একজন উম্মত হিসাবে জাতির এই দুরবস্থার কারণ ও তা থেকে পরিত্রাণের পথ তুলে ধরার

চেষ্টা করছি। এই কাজ নিঃসন্দেহে প্রত্যেক উম্মতে মোহাম্মদীর কর্তব্য।

তিনি ইসলাম ও মানবজাতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেক বিষয় নিয়ে লিখেছেন। তাঁর বক্তব্যের কোনো অংশের উপরে যদি কারো আপত্তি থেকে থাকে সেটা লিখিতভাবে আমাদের জানালে সেটার উপর মুক্ত আলোচনা হতে পারে।

আপনারা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন, আজ ধর্মকে ব্যবহার করে স্বার্থান্বেষী একটি শ্রেণি মানুষের ঈমানকে ভুল খাতে প্রবাহিত করে জাতিবিনাশী কাজে ব্যবহার করেছে। কেউ জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডে, কেউ অপরাজনীতিতে, কেউ ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধারে ব্যবহার করেছে। অথচ আল্লাহ ইসলামকে পাঠিয়েছেন মানবজাতির শান্তির জন্য। সাধারণ ধর্মবিশ্বাসী মানুষের ইসলাম কী, ইসলামের কোন আমলটি কেন করতে হবে, রসুল আগমনের উদ্দেশ্য কী, উম্মতে মোহাম্মদী নামক জাতিটি কেন গঠন করা হয়েছিল এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা (আকিদা) নেই। ইসলামের সবচেয়ে বুনিয়াদি একটি বিষয় হলো, আকিদা সঠিক না হলে ঈমানের কোনো মূল্য নেই আর ঈমান না থাকলে আমল অর্থহীন। এ বিষয়ে সকল হক্কানি আলেমগণ একমত। **ইসলামের সেই মহা মূল্যবান আকিদা কী তা যদি জনগণকে শিক্ষা দেওয়া না হয় তবে ঈমান ভুল পথে প্রবাহিত হবেই।** সংক্ষেপে শুধু এটুকুই বলা যায়, আকিদা হলো কোনো বিষয় সম্পর্কে সঠিক ও সম্যক ধারণা (Comprehensive concept)। আর আমল হলো সালাহ (নামাজ), যাকাত, হজ্ব, সওম (রোজা) ইত্যাদি এক কথায় সত্যদীন প্রতিষ্ঠায় সেই সমস্ত কাজ যা মানুষের কল্যাণ করে, সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে তা সবই আমলে সালেহ। কিন্তু মানুষকে দুঃখ-কষ্টের মধ্যে নিমজ্জিত রেখে সেদিকে দৃষ্টিপাত না করে, নিজের জীবন-সম্পদ উৎসর্গ করে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা না করলে কারও ব্যক্তিগত আমলই কবুল হবে না। আজ পৃথিবীময় মুসলিমদের আল্লাহ-রসুলের প্রতি ঈমান আছে, আমল হচ্ছে প্রচুর কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে সঠিক আকিদা না থাকার কারণে ঈমান ও আমল সবই অর্থহীন হয়ে যাচ্ছে। মুসলিম জাতির দুর্গতি কমছে না, বরং দিন দিন বাড়ছে।

সোনায় হাতুড়ির আঘাত পড়লে তা অলঙ্কারে পরিণত হয়। তেমনি সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য নির্যাতন ও ত্যাগ স্বীকারকারী আমাদের আলেমগণ মানবজাতির অলঙ্কার। যুগে যুগে সত্য প্রতিষ্ঠায় ত্যাগ স্বীকার করেছেন, এমন কি অনেক আলেম ব্রিটিশ দুঃশাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে চরম আত্মত্যাগ করে নিজেদেরকে প্রকৃত আলেম বলে প্রমাণ করেছিলেন। যারা সাধারণ মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্যে পাশে দাঁড়াবেন, অন্যায় অবিচার থেকে মানুষকে মুক্তির পথ দেখাবেন জাতির দুর্দিনে সেই আলেমের আজ বড় প্রয়োজন। আমরা বিশ্বাস করি, তারা আমাদের সমাজেই আছেন, তাদেরকে কেবল জাগ্রত হতে হবে।

আল্লাহ বলেছেন, কেবলমাত্র জ্ঞানী ব্যক্তিরাই আল্লাহকে ভয় করে, নিশ্চয় আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশালী ক্ষমাশীল (সুরা ফাতির ২৮)। সুতরাং প্রকৃত আলেমের চিহ্ন হলো আল্লাহর হুকুমের পক্ষে, ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াতে তাদের হৃদয় কখনো কম্পিত

হবে না। তারা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করবেন, কোনো পার্থিব স্বার্থের জন্য নয়। আল্লাহর রসুল বলেছেন, 'আলেমগণ নবীদের ওয়ারিশ। নবীগণ দিনার বা দিরহামের উত্তরাধিকারী বানান না। তাঁরা কেবল ইলমের ওয়ারিশ বানান। অতএব যে তা গ্রহণ করে সে পূর্ণ অংশই পায়' (তিরমিযী: ২৬৮২)। তাই প্রকৃত আলেমগণ হয়ে থাকেন আল্লাহর রসুলের আসহাবদের মতো দুর্জয়, নির্লোভ, ইসলামের জন্য সর্বত্যাগী বিপ্লবী। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় সমুন্নত করবেন। (সুরা মুজাদালা ১১)। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, 'সাধারণ মো'মেনের চেয়ে আলেমের মর্যাদা সাতশ' গুণ বেশি।'

আজ মুসলিম উম্মাহর পুনর্জাগরণের জন্য আলেমদেরকে গুরুদায়িত্ব পালন করতে হবে। আল্লাহ আপনাদের যে জ্ঞান দান করেছেন তা নিয়ে আর ঘরে বসে থাকার উপায় নেই। কারণ কী? এর কারণ যে অন্যায় করে আর যে অন্যায়ের ব্যাপারে নিরবতা অবলম্বন করে এবং প্রতিকারের কোনো চেষ্টা করে না, তারা উভয়েই সমান অপরাধী, আল্লাহর ভাষায় মুজরিম। এবং যার সম্পদ বা জ্ঞান মানুষের কল্যাণে কাজে লাগে না, সেই সম্পদ ও জ্ঞান আখেরাতে তার কোনো কাজে আসবে না। এজন্য যারা হক্কানি আলেম তারা অবশ্যই জাতির দুঃখে দুঃখী হন, জাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করেন।

আমাদের জাতির মধ্যে লক্ষ লক্ষ আলেম থাকা সত্ত্বেও জাতিটি হাজারো ভাগে বিভক্ত হয়ে সকল জাতির কাছে মার খাচ্ছে। এটা দুঃখজনক। জাতিকে ঐক্যের গুরুত্ব শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব ছিল আলেম সমাজের। যারা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা না করে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত আছেন, তারা নিশ্চয়ই অনুধাবন করবেন যে, মো'মেনের জীবন তো এমন হতে পারে না। মো'মেন হওয়াই আমাদের প্রধান কর্তব্য। একজন মো'মেন যদি মোফাস্সির হন, আল্লামা হন, মোহাদ্দেস হন, শায়েখ হন, সেটা আরো গৌরবের বিষয়। কিন্তু সবার আগে আমাদের মো'মেন হতে হবে। কারণ আল্লাহ বলেছেন, জান্নাত কেবলমাত্র মো'মেনের জন্য। তিনি ওয়াদা করেছেন যে তিনি মো'মেনদেরকে পৃথিবীর কর্তৃত্ব দান করবেন (সুরা নূর ৫৫)। তাহলে যে জাতির কাছে পৃথিবীর কর্তৃত্ব নেই, উল্টো যারা সর্বত্র মার খাচ্ছে তারা কী করে নিজেদের মো'মেন দাবি করতে পারে? সালাহ, যাকাত, হজ্ব, সওম সবই মো'মেনের জন্য, মো'মেন না হয়ে এগুলো যতই আমল করা হোক কোনো লাভ নেই। অনেকে আমাদের কর্মীদের সুন্নতি লেবাস নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। এ বিষয়ে আমাদের কথা হচ্ছে, আমাদের কর্মীরা বিভিন্ন শ্রেণি-পেশা থেকে এসে তওহীদের ডাকে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন। যারা সাধারণ মানুষ কিংবা সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত তাদের সুন্নতি লেবাস পরিধান করার মানসিকতা ছোটবেলা থেকে গড়ে ওঠে নি। আল্লাহর রসুল বলেছেন, দীনকে সহজ করো, কঠিন করো না। যেহেতু আগে দরকার জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা তাই আমরা সত্যের পক্ষে, ন্যায়ের পক্ষে,

অন্যায়ের বিরুদ্ধে ইস্পাতকঠিন ঐক্যবিশিষ্ট একটি জাতিসত্ত্বা গঠন করাকেই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছি। **একটা জাতির মধ্যে বহু রুচি-অভিরুচির লোক থাকবে। এখনই যদি আমরা একটি নির্দিষ্ট লেবাসের শর্ত আরোপ করি তাহলে আর ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব হবে না। তাছাড়া কোর'আনে আল্লাহ বহু আয়াতে তওহীদের উপর সত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়াকে ফরজ করেছেন, কিন্তু যেগুলো ফরজ করা হয় নি সেগুলো যার যার ইচ্ছার উপর আমরা আপাতত ছেড়ে দিয়েছি।** যারা নবী করিম (সা.) এর ব্যক্তিগত সুন্নতগুলোও নিজে থেকে পালন করতে আগ্রহী তারা সেগুলো করছেন।

আমাদের এই সত্যনিষ্ঠ আন্দোলনের বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত অনেক অপপ্রচার করা হয়েছে। মিথ্যাপূর্ণ সমাজে সত্যের ডাক দিলে তার বিরুদ্ধে অপপ্রচার হয় - এটা নতুন কিছু নয়। ইসলামবিরোধী শক্তিগুলো ইসলামের নাম শুনলেই তার বিরুদ্ধে অপপ্রচারে লিপ্ত হয়। তারা চায় না যে, আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা হোক। তবে **আপনাদের প্রতি অনুরোধ থাকবে, আমাদের বিষয়ে কোনো অপপ্রচারে আপনারা প্রভাবিত না হয়ে আগে যাচাই করবেন।** আল্লাহ বলেছেন, কেউ যেন কারো উপর অপবাদ আরোপ না করে এবং কোনো দুষ্কৃতকারী ব্যক্তি কোনো সংবাদ নিয়ে আসলে বিশ্বাস করার আগে যেন তা অবশ্যই যাচাই করে নেয় (সুরা হুজরাত ৬)। আর আল্লাহর রসুল (সা.) বলেছেন, কোন মানুষের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে যাই শোনে তাই যাচাই না করেই অন্যের কাছে বর্ণনা করে দেয়।" (হাদীস-মুসলিম)। কাজেই আমাদের বক্তব্য আমাদের কাছেই শুনুন, অন্যের কাছে শুনলেও সেটা আমাদের থেকে যাচাই করুন। বাস্তব সত্য হলো আমরা সমগ্র পৃথিবীতে আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেদের জীবন-সম্পদ উৎসর্গ করেছি। আল্লাহর রসুল যেমন করে তাঁর সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের সঙ্গে কাজ করেছেন, সর্বশ্রেণির মানুষকে তওহীদের দিকে আহ্বান করেছেন তেমনি আমরাও সরকার থেকে শুরু করে সকল শ্রেণি, পেশার মানুষ, নেতৃবৃন্দসহ ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবার কাছেই আমাদের বক্তব্য তুলে ধরছি। তারা অনেকেই আমাদের বক্তব্যের সঙ্গে একাত্মতা পোষণ করেছেন এবং আমাদেরকে উৎসাহিত করেছেন।

এত বড় কাজ আমাদের একার পক্ষে করা সম্ভব নয়। এতে সরকারের সহযোগিতা যেমন লাগবে তেমন সর্বশ্রেণির মানুষকেও এগিয়ে আসতে হবে।

আরেকটি বিষয় আপনারা প্রত্যক্ষ করবেন, **বিগত শতাব্দীতে ইসলামকে জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠা করার জন্য বহু সংগঠন, বহু দল হয়েছে। তারা তাদের কর্মীদের অতুলনীয় ত্যাগ, কোরবানি সত্ত্বেও কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছতে পারে নি। এর একটি বড় কারণ হলো, পথ ভুল।** বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত থেকে একেকজন একেকরকম কর্মসূচি বানিয়ে নিয়ে কখনোই জাতীয় জীবনে দীন প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। নবী করিম (সা.) তো বহু পথে দীন প্রতিষ্ঠা করেন নি, তিনি নির্দিষ্ট একটি পথে করেছেন। আমাদেরকেও সেই পথটি অবলম্বন করতে হবে। তা হলো সবাইকে এক কলেমা

তওহীদে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। ইসলামের অনেক কিছু নিয়ে মতভেদ থাকলেও ১৬০ কোটি মুসলিম আজও এক কলেমার উপরে বিশ্বাসী। এই কলেমার ভিত্তিতেই জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে হবে, অন্যান্য মাজহাবগত মতভেদপূর্ণ বিষয়গুলোকে বৃহত্তর স্বার্থে আপাতত দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। তারপর সত্যদীন প্রতিষ্ঠা করি। আল্লাহ বলেছেন, তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠা করো এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না (সুরা শুরা ৩)। আর **দীন প্রতিষ্ঠার কর্মসূচি তো স্বয়ং রসুলাল্লাহ (সা.) বিশদভাবে বলেই গেছেন।**

তিনি বলেছেন, আল্লাহ আমাকে পাঁচটি কাজের আদেশ করেছেন। আমি তোমাদেরকে সেই পাঁচটি কাজের দায়িত্ব অর্পণ করছি।

(১) তোমরা ঐক্যবদ্ধ হবে

(২) (তোমাদের মধ্যবর্তী আদেশকারীর কথা) শুনবে

(৩) (আদেশকারীর হুকুম) মান্য করবে

(৪) (আল্লাহর হুকুম পরিপন্থী কার্যক্রম থেকে) হেজরত করবে

(৫) আল্লাহর রাস্তায় জীবন-সম্পদ দিয়ে জেহাদ (সংগ্রাম) করবে।

যারা এই ঐক্যবন্ধনী থেকে এক বিঘত পরিমাণও দূরে সরে যাবে, তার গলদেশ থেকে ইসলামের বন্ধন খুলে যাবে যদি না সে তওবা করে ফিরে আসে। আর যে জাহেলিয়াতের কোনো কিছুর দিকে আহ্বান করে তাহলে **সে জাহান্নামের জ্বালানি পাথরে পরিণত হবে, যদিও সে নামাজ পড়ে, রোজা রাখে এমন কি নিজেকে মুসলিম বলে বিশ্বাসও করে** [হারিস আল আশয়ারী (রা.) থেকে আহমদ, তিরমিজি, বাব-উল-ইমারত, মেশকাত]।

আল্লাহপ্রদত্ত এই কর্মসূচি রসুলাল্লাহ (সা.) তাঁর উম্মাহকে দান করেছেন, সেই কর্মসূচি মোতাবেক উম্মতে মোহাম্মদী সংগ্রাম করে গেছেন। এখন হেযবুত তওহীদও আল্লাহ প্রদত্ত সেই কর্মসূচি মোতাবেক সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে।

আমরা ইসলামকে একটি চূড়ান্ত ভারসাম্যপূর্ণ, আধুনিক, যুগোপযোগী, সময়ের বিবর্তনেও অম্লান, অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্য ও যুক্তিপূর্ণ, প্রাকৃতিক নিয়মের সঙ্গে পূর্ণ সঙ্গতিশীল, ব্যক্তিগত, সামাজিক ও জাতীয় জীবনে প্রয়োগযোগ্য, পৃথিবীর প্রতিটি ভৌগোলিক পরিবেশে আচরণযোগ্য, নারী-পুরুষ সকলের মর্যাদা ও মানবাধিকার রক্ষাকারী সকলের বোধগম্যরূপে তুলে ধরছি। এটি সর্বমহলে তুলে ধরা গেলে ইসলামবিদ্বেষী শ্রেণিটি ইসলামের ত্রুটি সন্ধান করতে পারবে না, ঘৃণা বিস্তারের সুযোগ পাবে না ইনশা'আল্লাহ। রসুলাল্লাহ (সা.) বলেছেন, ভূপৃষ্ঠে এমন কোন মাটির ঘর বা তাবু থাকবে না যেখানে ইসলাম প্রবেশ করবে না (মিকদাদ বিন আসওয়াদ (রা.) থেকে মুসনাদ ইবনে আহমাদ, মিশকাত শরীফ)। সত্যদীন প্রতিষ্ঠার এই সংগ্রামে আপনাদের সকলের সহযোগিতা আমরা কামনা করি।